সম্বোধি

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ

শারদ সংখ্যা — ১৪০৫

আগরপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

সম্বোধি

বর্ষ-২ / সংখ্যা-২
আশ্বিন ঃ ১৪০৫
সেপ্টেম্বর ঃ ১৯৯৮

সূচীপত্র ঃ

আমাদের কথা ১
বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চের বিগতদিনের ক্রিয়াকলাপ ৫

ঃ প্রবন্ধ ঃ

'স্বর্গ কি হবে না কেনা' - ডাঃ অভিজিৎ গুহ ৭
অপ্রচলিত শক্তি ও ভারতবর্ষ - হরিশ সরকার ১১
শিক্ষা ও তার কিছু কথা - সুধীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ১২
ক্যান্সার - সাবধানতা স্বাগত - ডাঃ উৎপল সান্যাল ১৫
আত্ম সমর্পণের অনিবার্যতা বা আধুনিকতার অভ্যাস - মানস বাগচী ১৭
গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক রেনে দেকার্তে - রবীন্দ্রনাথ দাস ২০
বিষয় ঃ খেলা - সাধন চট্টোপাধ্যায় ২৪
ও আলোর পথযাত্রী - শতচক্র ২৬
খেতে পারি, কেন খাব? - ডাঃ আর্যা মিত্র ২৭
টি. বি. বনাম এইড্স - ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য্য ২৯

ঃ কবিতা ঃ

সাদা পৃথিবী - ধীমান চক্রবর্ত্তী ৩৩
রাজুবালা দাসী - সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৩৩
নীনু - শিবেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ৩৩
তৃতীয় গ্রহে আলো - তন্ময় চক্রবর্ত্তী ৩৪
আত্মানুসন্ধান - শুভ বসু ৩৪
নায়ক - ভূমি আফ্রিকা - সম্রাট বসুচৌধুরী ৩৪
চোখ ফেরাও - সুব্রত চন্দ ৩৫
দহন - দুলাল ঘোষ ৩৫
নন্দনকানন - জয়ন্ত বিশ্বাস ৩৫
যাত্রাপথ - অরূপরতন ঘোষ ৩৬
দায় - শতদল চক্রবর্ত্তী ৩৬
পাগলটা - বিশ্বজিৎ রায় ৩৬
এখনো - প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত ৩৭
চিতা - শুচিস্মিতা সেনচৌধুরী ৩৭
ফেরা - শুভময় চক্রবর্ত্তী ৩৮
প্রকৃতি - সুহাস চন্দ ৩৮
চলাচল - সঞ্জয় সাহা ৩৮

ঃ গল্প ঃ

অনেক দূর - শৈলেন সরকার ৩৯
পাখা - অধীর বিশ্বাস ৪৪
আয়ুর যুদ্ধ - বিকাশ বসু ৪৬
ব্যালেন্স - শতদল দেব ৫১
ডাইনিং টেবিল - মৃদুলকান্তি দে ৫৩
পঞ্চাশ বছরে আরও একটি গল্প - পার্থ আচার্য ৫৬

ঃ প্রবন্ধ ঃ

চিরহরিতের কথক - শুভঙ্কর ঘোষ ৫৭
অচিরাচরিত অথবা Renewable শক্তির উৎস - ডাঃ স্বপনকুমার দাস ৬২
সবুজ ঘরের পরিনাম - অরূপ সরকার ৬৫
ব্রেখটের জীবনে-মননে জার্মানীর প্রভাব - ডাঃ সুকান্তি ভট্টাচার্য্য ৬৭
শিল্প কথা - জ্যোতিপ্রকাশ রায়চৌধুরী ৭৩
রবীন্দ্রবলয়ে নতুন ভাবনা - সুনীতিমোহন বিশ্বাস ৭৪
"গুরুর সে'দিন" - সমর সমাদ্দার ৭৬

ঃ কিশোর বিভাগ ঃ

ভূতুরে কাণ্ড - দীপক মজুমদার ৭৭
মায়াকাজল - শ্যামাপ্রসাদ সরকার ৮০
"টিনার সকাল" - সুকুমার শীল ৮২
শাক - পার্থসারথি দে ৮৩

প্রচ্ছদ ঃ জ্যোতিপ্রকাশ রায়চৌধুরী

আমাদের কথা

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিবর্তনের ইতিহাস। সভ্যতার একদিকে যখন পৃথিবী জুড়ে অশুভ শক্তি, সংস্কৃতির পরিপন্থী বিষয়ের দাপটে মানবসভ্যতার নাভিশ্বাস উঠেছে, ঠিক সেই সময়ের দ্রুততর রথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ গড়ে তুলতে নিবিড় ভাবে ব্যস্ত রয়েছে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মঞ্চ। আর এই কাজের হাতিয়ার হিসেবে আর এক উপস্থাপন — সম্বোধি। যদি আমাদের সামনে অনেক অন্ধকার, যদিও ভেজা রাস্তায় পথ চলতে হবে, যদিও কুয়াশায় আচ্ছন্ন আলো — তবু আমাদের ও পাঠকের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে একদিন এই পৃথিবীতে সুখের বান ডাকবে এ বিশ্বাস আমাদের ছিল, আছে এবং থাকবে।

বাংলা সাহিত্যের অমর দুই কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ও দুই অমর কবি নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাসের জন্মশতবার্ষিকীতে সম্বোধিতে কোনো লেখা প্রকাশ করা গেল না এজন্য আমরা দুঃখিত। বাংলার বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এর জন্মশতবার্ষিকীতে রইল আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। ইলেকট্রন আবিষ্কারের একশ বছর পূর্তি আমাদের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এই আমাদের আশা। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে আমরা আন্তরিক ভাবে মর্মাহত। বান ভাসি মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সম্বোধির তরফ থেকে প্রত্যেক সুস্থ সচেতন মানুষের কাছে রইল আমাদের বিনীত আবেদন।

সম্বোধির বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মনস্কতা কোন যুগবিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমাদের আন্দোলন সংগ্রাম কালোপযোগী এবং এই ভাবে 'এই পথে আলো জ্বেলে পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে' এই আশায় রইলাম।

‘স্বর্গ কি হবে না কেনা?’

ডঃ অভিজিৎ গুহ

প্রথম তুলি

বিজ্ঞান বা সাহিত্যের ওপরে কিছু লিখবার অনুরোধ (এবং নিজেরও ইচ্ছে) উপেক্ষা করতে হল। আমি বরং এবারে লিখব ধূলোর কথা, যেখানে অসীম সম্ভাবনার মুকুলের প্রস্ফুটন বা অকালে স্খলিত হবার আশঙ্কা পাশাপাশি বিদ্যমান। লিখব এমন মানুষদের কথা যাদের নিয়ে সাহিত্য, যাদের জন্য বিজ্ঞান — অন্তত হওয়া উচিৎ। কোন খ্যাতনামার জীবনী বা সুদূর নীহারিকাপুঞ্জের জন্মকাহিনী নয়, আমার অনুভূতি আচ্ছন্ন করে আছে গত কয়েকদিনের কিছু আলাপ, কয়েকটি মাটির মানুষের নিবিড় সংলাপ। আগরপাড়ার এক রিক্সাচালক, একটি ছোট মেয়ে যাকে জীবিকার প্রয়োজনে পরের বাড়ীতে কাজ করতে হয়, জয়নগর থেকে আসা এক মাসী যে মাথায় বিরাট বোঝা চাপিয়ে বাড়ী বাড়ী মুড়ি বিক্রি করে, ছাপরা জেলা থেকে আসা রাজমিস্ত্রী যে আটাত্তর বছর বয়সে দোতলা থেকে এক পায়ে ঝুলে ঢালাইয়ের তক্তায় পেরেক লাগায়, এক চাষী যে বাড়তি আয়ের জন্য সন্ধ্যাবেলায় সোদপুরে রিক্সা টানে — এমনই সব মানুষদের কথা তাদেরই ভাষায়, আমি অনুলেখক মাত্র।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আশির দশকের গোড়ায় এমন একদিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন যেদিন ‘গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ধূলো মাখা তিনটে বাচ্চা ছুটে এসে বলবে/ ওগো, আমরা বাসি রুটি চাই না, পাঁচ নয়া চাই না/আমাদের ছাই রঙের হাফ প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরিয়ে/ চুল আঁচড়ে দাও/ আমাদের গাল টিপে দিয়ে বলো, সাবধানে—/আমরাও ইস্কুলে যাবো/’ কবি কল্পনা নয়, এ গণজাগরণ আজ অঙ্কুরিত হয়েছে সত্যের আজিনায়, প্রত্যক্ষ করেছি দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এক নব চেতনার উন্মেষ। ‘জল বাড়ছে, জল বাড়ছে’। তাদের কথা বলার ভঙ্গিতে , অঙ্গুলি সঞ্চালনে, চোখের তারার দীপ্তিতে দেখেছি একবিংশ শতকের রেনেসাঁস-এর সমস্ত প্রতিশ্রুতি। একি নষ্ট হয়ে যাবে সুযোগের অভাবে, অর্থের অপ্রতুলতায়, রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর অপর্যাপ্ততায়, শিক্ষানীতির ভ্রান্তিতে, শিক্ষিতদের অসহযোগিতায়, শিক্ষায় সংযুক্ত অনেকের মূল্যবোধের দৈন্যে?

আশা

এ প্রবন্ধ বিদগ্ধ নয়, পরিসংখ্যানে আকীর্ণ নয়, তাত্ত্বিকতার সমৃদ্ধি নেই এতে। এ রচনা কাহিনী ভিত্তিক,- অ্যানেকডোটাল। এর ভিত্তি মনের গভীর স্পর্শ করে এমন কিছু ইম্প্রেশন। প্রথম গভীরতম ছাপ ফেলেছিল আগরপাড়ার এক রিক্সাচালক। এখানে তার নাম দেওয়া যাক গগন। সে শুরু করেছিল এই ভাবে — “টাকার বড় টানাটানি। তাই জ্বর তবু বাইর হইতে হইল। কালকের মধ্যে স্কুলে ৩০৫ টাকা জমা না দিলে ছেলেটারে উঁচা ক্লাসে তুলবে না। এত টাকা কোত্থিকা জোগাড় করি বলেন তো? এখনো অল্প কিছু বাকী।” গগনের বয়স হয়ত আমার সমান, কিম্বা কিছু বেশী। জিজ্ঞেস করলাম, “কোন স্কুলে ছেলে পড়ে?” অনতিদূরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে, “ঐ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটায় ক্লাস থ্রীতে উঠবে টাকা দিতে পারলে।” মৃদু চমকাই। “এরপরে আবার প্রাইভেট টিউটরের পয়সাটা জোগাড় করতে হইবে। মাস গেলে ১২৫ টা টাকা দিতে হয়। তারপরে টিফিনটাও ভাল দিতে হয়।” চমক বাড়ে। সে এবারে হিসাব আরো বিশদ করে—“প্রতিদিন রিক্সার মালিকরে দশটাকা দিতে হয়, ছেলেটার স্কুলের মাইনে, টিউটর, টিফিন নিয়া গড়ে দৈনিক খরচ দশ টাকা, আমার চা, বিড়ি, রুটির পিছনে যায় পাঁচ টাকা। মানে দিনে পঁচিশ টাকা আয় করার পরে যেইটুকু আর তুলতে পারি তাই দিয়া সংসার চালাইতে হয়।” খানিক বিরতি দিয়ে বলে, “এ পাড়ার লোকগুলা একদম সুবিধার না। যখন তখন ঘরে ঢুইক্যা রিক্সাওয়ালা বইলা ডাকে। আমি কি শালা সব সময় রিক্সাওয়ালা ? আমি না হয় রিক্সা টানি, কিন্তু আমার ছেলের তো বড় বড় বন্ধু সব, তার তো একটা স্ট্যাটাস আছে।”

আমার মনে তিরতির করে কাঁপে কালীচরণের ছায়া। বুদ্ধদেব বসুর তুলিতে সে ফোটে এইভাবে—‘চোখের সামনে ভেসে উঠল/আমার পরিত্যক্ত পাঞ্জাবী পরে হেঁটে চলেছে কালীচরণ/ ... কেমন তার বাড়ি ভাবতে পারি না, / হয়তো মাটির ঘর, হয়তো বাঁশের বেড়ায় খড়ের ছাউনি, / সেখানে আমাদের কালী নয় সে, / কারো স্বামী, কারো পিতা, কারো পুত্র। / সেখানে সে বন্ধু, সে ভাই।’ আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গগন তখন ‘নিজের চেয়ে আরও অনেক লম্বা হয়ে উঠে’ ছাড়িয়ে গেছে আকাশ ও ছায়াপথ।

মন আর্দ্র হয়ে উঠেছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষাহীন দূরদর্শী পিতার নিরলস ত্যাগ ও কর্মসাধনায়। কিছু টাকার জন্য তার এ পরিশ্রম বিফলে যাবে ? আগামীকালের মধ্যে বাকি টাকা সংগ্রহ করতে না পারলে ওর ছেলেটা পারবে না ক্লাস থ্রীতে উঠতে ? কম-পুঁজির আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম দরকারী টাকাটুকু নিতে।

সে ফিরিয়ে দিল কশাঘাত—"আমায় টাকার লোভ দেখাইতাছেন ? হাত-পা টা যতদিন আছে ততদিন খাইট্যা টাকা রোজগার করুম। পারলে একটা ছোটোখাটো কাজ জোগাড় কইরা দেন।" " শোনেন, জীবনে কখনো ছোটো বা বড় উপকার করবেন না। বড় উপকার করলে অনেক ঝামেলা। বিদ্যাসাগর মশাই বলছেন, সে আমারে গালাগালি দেয় কেন, আমি তো তারে কোনো উপকার করি নাই। আর ছোটো উপকারও করবেন না, যেমন ধরেন টাকা দেওয়া। কেন্ জানেন ? টাকাটা খাইয়া ফেলুম, তারপরে আপনার কাছে আবার চামু। দ্বিতীয়বার আপনি আর দিবেন না, তখন গালাগালি দিমু। এইজন্য।"

জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে যেটা করা অভিপ্রেত, অর্থাৎ মধ্যম ধরণের উপকার, সেটা কি ? বলল—" যেইরকম আমার মেয়েটারে একটু পড়াইয়া দেন না ! ক্লাস ওয়ানে পড়ে। স্যালারিটা দিতে পারুম না।" এই বলে তক্ষুনি তার বাড়ীতে গিয়ে মেয়েটাকে একটু দেখে আসবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সীমা নামের ছোট্ট মেয়েটিকে বাড়ীতে বাড়ীতে কাজ করতে হয়। কিন্তু সে স্কুলে পড়ে। আমায় জানিয়েছে অঙ্ক করতে তার ভালো লাগে। কিছু অতিরিক্ত কাজের বিনিময়ে বাড়তি আয়ের প্রলোভন কাটিয়ে সে এক গৃহকর্ত্রীকে জানিয়েছে—"আমি পারব না। আমার আজ ভূগোল পরীক্ষা আছে।" 'পিসীর জ্বর' বা 'বৃষ্টি'র মত ট্রাডিশনাল এক্সকিউজ নয়, সীমারা আজ ভূগোল পরীক্ষার জন্য নিজস্ব কিছু সময় বাঁচিয়ে রাখছে, সে কথা সোচ্চারে বলছে। জয়নগরের মাসীর মুড়ি বিক্রীর আয় ছেলেমেয়ের পড়াশুনোর জন্য, সিঁদুর-পরা ঘোমটা-টানা গৃহবধূটি আজ পথে নেমেছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে। সেদিন একগাল হেসে জানাল ছেলে মেয়ে দু'জনেই হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হয়েছে। ছেলে কলেজে ঢুকল, মেয়ের বে' দেবে। ছাপরার রাজমিস্ত্রী বাংলার জলহাওয়া রপ্ত করেছে, মীনা সিনেমার পাশে এক সঙ্কীর্ণ আস্তানায় তার সমস্ত কর্মজীবন কেটে গেল পরিবারহীন একাকীত্বে অর্থ উপার্জনের তাগিদে। ফসল কাটার সময় যায় দেশে। থরথর হাতে সে শক্ত দেওয়াল গাঁথে। কিন্তু সে ছেলেকে "স্কুলে পড়িয়েসে"। প্রস্তাবিত কল্যাণী হাইওয়ের পাশে বেশ খানিকটা নিজস্ব জমিতে চাষ করে যে সারাদিন ধরে সে সন্ধ্যাবেলায় সোদপুরে রিক্সা চালায়। বলল এই অতিরিক্ত উপার্জনটুকু তার দরকার ছেলেটাকে পড়ানোর জন্য।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে নড়বড়ে বেড়ার দেওয়াল ও টিনের ছাদওয়ালা ইস্কুলে। কাঁচা মাটির ঢেউখেলানো মেঝে। বৃষ্টির জল ঢুকত। পড়াতে পড়াতে চক ফুরিয়ে গেলে হেডমাস্টারমশাই আমাদেরই কাউকে পাঠাতেন দোকান থেকে কিনে আনতে। তখন ট্রানজিস্টর ও আকাশবাণীর যুগ। মনের মত গান, অনুরোধের আসর, সুচিত্রার সংসার, পি থ্রী রহস্য সিরিজ। তারপরে একসময় একমাইল হেঁটে নিকটতম টেলিভিশন-সমৃদ্ধ বাড়ীতে গাদাগাদি ভীড়ে পেলে-র খেলা দেখে চপ্পল খুইয়ে প্রত্যাবর্তন। সেই টিভি সমস্ত মধ্যবিত্তের ঘর ভরিয়ে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করল ক্রমে। আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দেওয়াল পাকা হল। এল কেব্‌ল টিভি, ওয়াশিং মেশিন। রক্তমজ্জা নিংড়ে নলকূপের হাতল চালিয়ে জল তোলা নয়, এখন বেসিনে নব ঘুরিয়ে মুখ ধোওয়া। শিশুদের ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে ম্যাডোনার ছবি। এল টেলিফোন বিপ্লব। মোড়ে মোড়ে এস টি ডি বুথ, ঘরে ঘরে বোতামওয়ালা টেলিফোন। টেক্‌নোলজি এবং ভোগ্যপণ্য অনিবার্য্য গতিতে সমাজে ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনবে আরো। এ রচনার বিষয়বস্তু তা নয়।

বলতে চাইছি চেতনা ও কৃষ্টির কথা। বাঙালী মধ্যবিত্তের যেমন একটা বিশেষ কালচার আছে। ছেলেমেয়ের স্কুলে যাওয়া সেখানে প্রায় বাধ্যতামূলক। সকাল সন্ধ্যায় বাড়িতে নিয়মিত পড়তে বসতে হয়। মা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকেও লক্ষ্য রাখেন পড়ায় মনোযোগ রাখছে কিনা, স্কুলের হোমটাস্ক সব করে নিয়ে যাচ্ছে কিনা। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটা হারমোনিয়াম আছে। এমন বাঙালী মেয়ে কম পাওয়া যাবে যে অন্ততঃ কিছুদিন ভোরে উঠে সা-রে-গা-মা রেওয়াজ করে নি। বাঙালী মধ্যবিত্ত বই কেনে, কবিতা পড়ে, বই উপহার দেয়। বিচিত্র বিষয়ে আড্ডা দেয়। এমন নয় বাঙালী মধ্যবিত্তের কৃষ্টি স্থিতিশীল। সময়ের সাথে এর বিবর্তন হচ্ছে। যেমন, দুর্গাপূজা নয়, ভাই-ফোঁটা নয়, পঁচিশে বৈশাখ নয়, গত দুই দশকে সবচেয়ে বড় বার্ষিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা! ছেলেমেয়েরা এখন আর দলবেঁধে কোর্ট কেটে গাদি বা কাবাডি খেলে না ; খেলবেই বা কোথায় ! এ তালিকা আরো দীর্ঘ করা সম্ভব। কিন্তু তবু, শিক্ষা ও সৃজনশীলতার উপর দুর্নিবার আকর্ষণ বাঙালী মধ্যবিত্তের নিশ্চিত লক্ষণ, কালজয়ী বৈশিষ্ট্য।

পুনশ্চ ঃ প্রতিপাদ্য

এ রচনার মূল প্রতিপাদ্য নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররাও আজ পরবর্ত্তী প্রজন্মের শিক্ষার জন্য অন্তরের এই তাগিদ অনুভব করছে। একে ধারণ ও বিকশিত করতে পারলে আগামী শতক হবে গৌরবময়। রাজনৈতিক নেতারা ও শিক্ষাবিদরা জনশিক্ষা ও গণজাগরণের এ অভূতপূর্ব সুযোগ কি কোনো মূল্যেই নষ্ট হতে দেবেন ?

আশঙ্কা

এত আশার কথার মাঝে আশঙ্কার কথাও অনেক। অর্থের অভাব শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় সারা দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল মোট ব্যয়ের ৭·৮%, ষষ্ঠে ২·৭%, সপ্তমে ৩·৯%, অষ্টমে ৪·৯%। বেসরকারী দলিল অনুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে বরাদ্দ ছিল জাতীয় উৎপাদনের ১·২%, ১৯৯০-৯১ সাল বরাদ্দ ৩·৯%। এর ৯৬% খরচ হয়ে যায় মাস-মাইনে দিতে ! তাহলে উন্নয়ন হবে কোথা থেকে ? আমরা তো এখন বোমা ফাটাতে সক্ষম। আর শিক্ষার জন্য টাকা নেই ? প্রাথমিক স্তরে ছাত্র প্রতি বছরে গড়ে ১০০০ টাকা খরচ হয়। সংবাদপত্রের বিবরণ অনুযায়ী মাত্র কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতা যে পরিমাণ টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ তাতে কত শিশুর শিক্ষা হত ?

একই মুদ্রার অপরপিঠ শিক্ষার পরিকাঠামোর অভাব। আধুনিক প্রযুক্তি, যেমন কম্পিউটারের, ব্যবহারের প্রশ্ন তুলছি না (সে তো বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যাপ্ত নয়), বিষয়টা ন্যূনতম প্রয়োজনের। রাজ্যে ৫৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩৮ শতাংশের পাকা বা আধ পাকা বাড়ি আছে। (প্রবন্ধে ব্যবহৃত এই এবং অন্যান্য পরিসংখ্যান ১৯৯৮ সালের 'দেশ' পত্রিকার ১৩ জুন ও ২২শে আগষ্ট সংখ্যাদ্বয় থেকে সংগৃহীত।) পড়ুয়াদের ৪৫ শতাংশ মেয়ে এবং ৮০ শতাংশ প্রাথমিক স্কুলে কোনো শৌচাগার নেই। এক তৃতীয়াংশের বেশী স্কুলে প্রথম থেকে চতুর্থ এই চারটি শ্রেণীর জন্য একটিই ক্লাসঘর। মাত্র ২৮ শতাংশ স্কুলে অন্ততঃ চারটি ঘর আছে। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত আগে ছিল ৪০, এখন বিধি অনুযায়ীই ৮০।

এর পরের প্রশ্ন যারা নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্কুলে যায় শেষপর্যন্ত তারা শেখে কি ? এ ব্যাপারে ১৯৯১ সালে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং স্টেট কাউন্সিল অব্ এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিংয়ের যৌথ উদ্যোগে যে রাজ্যব্যাপী সমীক্ষা হয় তার ফলাফল হতাশাব্যঞ্জক। সরকারী ব্যবস্থাপনার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর একজন পড়ুয়ার থেকে ন্যূনতম যা প্রত্যাশিত তা তারা অর্জন করতে পেরেছে কিনা এই সমীক্ষায় তাই মাপা হয়েছিল। শুধু বাংলায় ন্যূনতম প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে পেরেছিল ২৬% ছাত্রছাত্রী, গণিতে ৩৬%, আর বাংলা ও গণিত এই দুটোতে একসাথে প্রত্যাশিত মান অর্জন করেছে মাত্র ২০%। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় এমন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এখন প্রতি তিনজনের মধ্যে দুইজনই আসে দারিদ্রসীমার নীচের পরিবার থেকে — এ নিঃসন্দেহে এই রাজ্যের গর্বের ও কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু প্রতি পাঁচজনের চার জনই চার বছর প্রাথমিক স্কুলে পড়েও ন্যূনতম মানও অর্জন করতে পারে না — এ তেমনই গভীর উদ্বেগের।

আর এক সমস্যা এখানে প্রচলিত শিক্ষার ধারা। শিক্ষাবিদের তকমা না এঁটেই অত্যন্ত গভীরভাবে জানাতে চাই যে আমার মতে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য উপযুক্ত প্রশ্ন করতে শেখানো। আর এখানকার শিক্ষাব্যবস্থার পুরো emphasis-টাই উত্তর মুখস্থ করানোয়। এখানে স্কুলে পড়া মুখস্থ বলতে হয় ঃ না পারলে শাস্তি, আর পারলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হল ! ছাত্ররা এমনকি প্রবন্ধ মুখস্থ করে, অঙ্ক মুখস্থ করে। এমন কি স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞানের বহু ছাত্রছাত্রীও গত দশ বছরের প্রশ্ন ঘেঁটে 'সাজেশান' বানিয়ে শুধু বাছা বাছা কয়েকটি উত্তর মুখস্থ করে বিজ্ঞান শেখে ! রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী কি একবিংশ শতকেও প্রাসঙ্গিক থাকবে ?

শিক্ষাপদ্ধতির সাথে সাথে পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে কল্পনা এবং শিশু ও কিশোর মানসিকতার সঙ্গে সংযোগ প্রয়োজন। সম্প্রতি মর্মর মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাওড়ার উদং-সহ মোট ২০ টি গ্রামে সমীক্ষা হয়। এই সমীক্ষায় দেখা গেছে অর্থনৈতিক কারণ প্রধান নয়, বিরক্তিকর একঘেয়ে পাঠক্রমই পড়ুয়াদের স্কুলছুটে পরিণত করেছে। যে সব স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে ৪৯% ছিল স্কুলছুট সেখানে গানবাজনা, খেলাধূলো চালু করতে স্কুলছুটের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৭%। (আজকাল, ২৮/৮/৯৮)।

পাঠক্রমের প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে আসে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজীর কথা। শিক্ষাতত্ত্বের কচকচানি থাক, সরকারী স্কুল থেকে ইংরেজী তুলে দেওয়ায় রাজ্যে শিক্ষায় two--tier system চালু হয়েছে। চাষীর ছেলের ইংরেজী জানার দরকার নেই, অধিকার নেই ? যে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়া ছেড়ে দিল তার ইংরেজীর প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান থাকবে না ? সকলের শেক্সপীয়ার পড়ার দরকার নেই, কিন্তু সরকারী ফর্ম বুঝবার দরকার আছে, অসাধুদের বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচার দরকার আছে। 'দেশ' পত্রিকার সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষারত সেরা ছাত্রছাত্রীদের ৪০% এসেছে ইংরেজী মাধ্যম স্কুল থেকে, ৩১% এসেছে বাংলা মাধ্যম যেখানে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী পড়ানো হয়, ১৭% এসেছে বাংলা মাধ্যম থেকে যাদের বাড়ীতে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কেবল ১২% বাংলা মাধ্যমের যাদের পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়েছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সঙ্গে দ্বিতীয় একটা ভাষা শেখার সংঘাত কোথায় বুঝতে পারি না। প্রাথমিকে তো পাশ-ফেল প্রথাও বহুদিন উঠে গিয়েছে, তাহলে অসুবিধা কোথায় ? ভবতোষ দত্ত কমিশনের মত অনুযায়ী না হয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেই পড়ানো হোক ইংরেজী, যদি এত অসুবিধা।

আমি শিক্ষক হয়েও এবার যে বিষয়টার উল্লেখ করব তাতে অনেক শিক্ষক হয়ত প্রীত হবেন না। কিন্তু এ আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে। যে মাষ্টারমশাইরা তাঁদের নিরলস সাধনায় শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখ থুবড়ে পড়তে দেন নি তাঁরা আমার এবং ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারবর্গের বিনম্র শ্রদ্ধা নেবেন। কিন্তু সাধারণভাবে স্কুল বা কলেজগুলিতে তেমন পড়াশুনো হয় না।

ছাত্রছাত্রী ও পরিজনদের কোনো ভরসা নেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উপর। পরিত্রাণের আশায় গড়ে উঠেছে এক সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা : আধুনিক টোল। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে এমন অর্ধেকেরই প্রাইভেট টিউটর রয়েছে। মধ্যবিত্তের সাথে সাথে নিম্নবিত্তরাও আজ একইভাবে প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ হচ্ছে, এমনকি দুইবেলা যারা খেতে পায় না তারাও। অথচ এই আধুনিক টোল কোনো মুশকিল আসান রূপে দেখা দেয় নি। কারণ এগুলির অনেকই স্কুল-কলেজের লঘু সংস্করণ, নিছক ব্যবসাকেন্দ্র। ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও মননশীলতা বৃদ্ধি করবার কোনো সুযোগ সেখানে নেই। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে দল বেঁধে নোট টুকতে যায়। এছাড়া বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাব্যবস্থা ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে নানারকম অসঙ্গতি ও অসন্তোষের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এসব আত্মঘাতী ব্যবস্থা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আত্মঘাতী কারণ কলেজ শিক্ষকদের নিজেদের ছেলেমেয়েরাও স্কুলে ভুগছে, স্কুল শিক্ষকদের ছেলেমেয়েরা কলেজে ভুগছে। আত্মঘাতী কারণ এতে সামগ্রিকভাবে জাতি ডুবছে। শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন দেবার সাথে সাথে তাঁদের কাজের accountability সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাঁদের তো সমাজের দিশারী হবার কথা।

এ আত্মসমালোচনা পড়ে শিক্ষক নন এমন পাঠকরা ঘুণাক্ষরেও ভাবেন না শুধু মাষ্টারমশাইরা ছাত্রদের সব শিখিয়ে দিতে পারবেন। তাঁরা সাহায্য করতে পারেন মাত্র, শিখতে হবে শিক্ষার্থীদের নিজেদেরকেই। এজন্য তাদের অন্তরের তাগিদ থাকতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, নিজেকে উদ্যোগী হতে হবে।'আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব/না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব' —কোন শিক্ষক তো সুকুমার রায়ের ছড়ায় বর্ণিত এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন না। ছলেবলে কৌশলে একটি সার্টিফিকেট জোগাড় করাই যদি কোন ছাত্রের লক্ষ্য হয় তবে সেরা শিক্ষকও কিছু করতে পারবেন না। বহু দায়িত্ববান শিক্ষক ছাত্রদের এই মনোভাবে, পরিকাঠামোর অভাবে, এবং যোগ্যতা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতির অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যাঁরা ট্রেনে বাসে পাড়ার মোড়ে শিক্ষকদের তুলোধুনা করেন তাঁরা এই দিকটি মনে রাখবেন। শেষ পর্য্যন্ত the onus of learning শিক্ষার্থীর ওপর। তারা তা নিচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব অভিভাবকদের। পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু লেখার পরিসর এখানে নেই। শুধু দারিদ্র ও পারিবারিক রেওয়াজ — এর সাথে উচ্চশিক্ষার সম্বন্ধ নিয়ে দু'এক কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে। সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে খবরাখবর পাওয়া খুব প্রয়োজন। এর অভাব আমি অনুভব করেছি সর্বদা। এই কারণে আমার কোনো পরিকল্পনা ছিল না ; শিক্ষাজীবন কেটেছে গড়িয়ে, সবসময়ই শুধু অব্যবহিত নিকট লক্ষ্যকে ঘিরে। এমনকি এঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেলের এন্ট্রান্স পরীক্ষাগুলো সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি অনেক দেরীতে, বিশেষ প্রস্তুতি তো দূরের কথা। আমি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট করতে গিয়েছিলাম ভারত থেকে সাম্মানিক নেহেরু স্কলারশিপ এবং ইংল্যাণ্ড থেকে প্রিন্স অব্ ওয়েলস স্কলারশিপ নিয়ে। এই দ্বিতীয় স্কলারশিপটি ট্রিনিটি কলেজ দেয় বছরে একটি, সব বিষয় মিলিয়ে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ইত্যাদি কমনওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশগুলোর মধ্যে সেরা ছাত্র বা ছাত্রীকে। এ খবর আমার জানা ছিল না ; ওনারা আমার ক্রিডেনশিয়াল দেখে মনোনীত করেছে আবেদন না করা সত্ত্বেও! এতে আমার শুভানুধ্যায়ীরা ঠেলেঠুলে আমায় বিদেশে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই আমি তখনো রেফ্রিজারেটর নিজে ধরে দেখি নি, টেলিফোনের কোন্‌দিক কানে কোন্‌দিক মুখের কাছে ধরতে হয় সে সম্বন্ধে সম্যক ধারনা ছিল না। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেও আমি হাবুডুবু খেয়েছি, তাহলে আমার থেকেদরিদ্রতর ছাত্ররা কি করবে জানি না। 'দেশ' পত্রিকার সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে সেরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র এক শতাংশ দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছে, শিক্ষায় প্রথম প্রজন্ম এমন পরিবার থেকে আসা উচ্চশিক্ষারত ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ০.৯ শতাংশ। গায়কী পরিবারের ambience-এ যেমন গানের চর্চা সহজতর, তেমনি শিক্ষিতের পরিবারে শিক্ষার। পরিবারের আর্থিক মূলধনের তারতম্য শিক্ষালাভের সুযোগে গভীর বৈষম্য আনে। যোগ্য গরীব ছাত্রের উচ্চশিক্ষালাভের পথ কি কোনোভাবেই আর একটু সুগম করা যায় না?

শেষ তুলি

ভারতীয় সংবিধানে সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু 'অধিকার' শব্দের সম্যক তাৎপর্য্য কি? এর রূপায়ণের প্রকৃতি ও পদ্ধতি কি হবে?

পশ্চিমবঙ্গ এক যুগসন্ধি ক্ষণে দাঁড়িয়ে। দরিদ্রের ছেলেমেয়েরা আজ দলে দলে বিদ্যালয়ে আসছে। দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বাবামায়েরা তাদের অস্থিমজ্জা নিংড়ে দিচ্ছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করতে। তাদের এই ঐকান্তিক চেষ্টা পাবে না রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সহযোগিতা? শিক্ষাব্রতী ও বিত্তবানদের সাহায্য? শিক্ষকদের অকুণ্ঠ শ্রম ও দিকনির্দেশ? একবিংশ শতকে এ রাজ্য দেবে না আলো?

গগনরা তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, জীবন বন্ধক রেখেছে সন্তানের শিক্ষার জন্য। 'এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা? / স্বর্গ কি হবে না কেনা? / বিশ্বের ভান্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?/ রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?'